বাৎসরিক বিজ্ঞান সংখ্যা, ২০২৩
প্রথম বিজ্ঞান সংখ্যা

সমাজ

সাহিত্য • বিজ্ঞান • সমাজবিজ্ঞান

ত্রয়োদশ বর্ষ ।। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ।। ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ISSN: 2395-2342

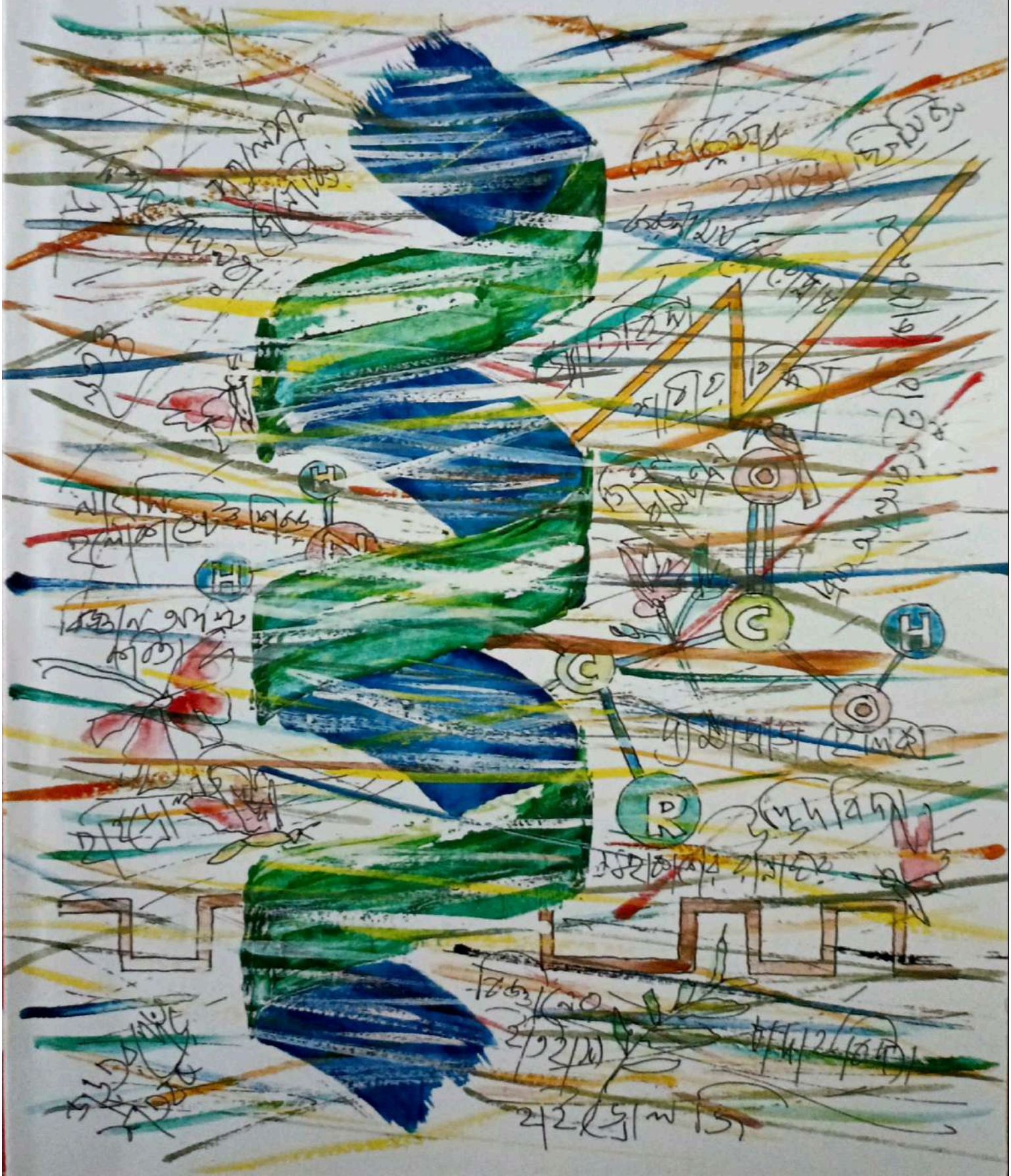

দ্য মাদ্রাজ হেলিক্স
শতবর্ষে ভারতের প্রথম স্ট্রাকচারাল বায়োলজিস্ট
জি এন রামচন্দ্রন

জি এন রামচন্দ্রন
(১৯২২ – ২০০১)
শিল্পী শুভঙ্কর বিশ্বাস। সৌজন্যে DeviantArt website

গোপালসমুদ্রম নারায়ণ রামচন্দ্রন বা সংক্ষেপে জি এন আর, যে নামেই তাঁর পরিচয় দেওয়া হোক না কেন, খুব স্বল্প সংখ্যাক ভারতবাসীই তাঁকে চিনবেন। যাঁরা স্নাতকস্তরে বায়োলজি পড়েছেন তাঁদের কাছে নামটি পরিচিত হলেও হতে পারে। বিজ্ঞানী সি ভি রামনের অত্যন্ত প্রিয় এই ছাত্রটির হাত ধরে প্রোটিনের গঠন বিষয়ক গবেষণা যে এই মাটিতেই বিশ্বমান ছুঁয়েছিল সে কথা আজ কালের গর্ভে হারিয়েছে।

কোভিড-কালে করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত। ভাইরাসটির বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিন তৈরির যত প্রচেষ্টা হয়েছে তার অর্ধেকই টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছিল এই স্পাইক প্রোটিনকে। এটির বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে হলে এর গঠন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা প্রয়োজন। কীভবে প্রোটিনের গঠন বুঝতে হয় সেই কাজের অন্যতম ভগীরথ ছিলেন রামচন্দ্রন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বিজ্ঞানীরা প্রোটিনের আণবিক গঠন বুঝতে এক্স রশ্মির ব্যবহার আবিষ্কার করেন। প্রোটিনকে ক্রিস্টালে পরিণত করে তার উপর এক্স রশ্মি প্রয়োগ করলে ক্রিস্টালের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় রশ্মির diffraction বা অপবর্তন ঘটে। ফলে পিছনে রাখা এক্স-রে প্লেটে রশ্মির যেখানে আপতিত হওয়ার কথা সেখানে আপতিত না হয়ে তা বিচ্যুত পথ অনুসরণ করে আশেপাশে সরে যায়। এইভাবে যে ছবি তৈরি হয় তা থেকেই বিজ্ঞানীরা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে প্রোটিনের ভিতর বিভিন্ন পরমাণু এবং রাসায়নিক বন্ধনের অবস্থান বুঝতে পারেন।

ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স (আই আই এস সি), ব্যাঙ্গালোরের পদার্থবিদ্যার উজ্জ্বলতম ছাত্র এবং কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরির ডক্টরেট রামচন্দ্রন সারা জীবনে প্রায় আড়াইশোর মত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। গবেষকজীবনের প্রথম পাদেই, ১৯৫৫ সালে, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান থাকাকালীন প্রকাশিত কোলাজেন (Collagen) নামক প্রোটিনের ট্রিপল হেলিক্স গঠন সংক্রান্ত গবেষণা তাঁকে বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। কোলাজেন হল আমাদের দেহের সবচেয়ে সুলভ প্রোটিন; মোট প্রোটিনের প্রায় ৩০%। ত্বকের নীচের স্তর, যা ডারমিস (dermis) নামে পরিচিত, তার প্রায় পুরোটাই কোলাজেন। প্রাণীর চামড়া থেকে বানানো যেসব বস্তু আমরা ব্যবহার করি, যেমন জুতো, বেল্ট, ব্যাগ ইত্যাদি তা আসলে কোলাজেন ছাড়া কিছু নয়। এছাড়া অস্থি, টেন্ডন, কার্টিলেজ এবং অন্যান্য অনেক যোগকলার মুখ্য উপাদানও কোলাজেন। বলা যায়, আপনি এই যে মানুষটা, হাঁটছেন চলছেন বসছেন, আপনার শরীরটার যে অস্তিত্ব— তার পিছনে রয়েছে কোলাজেন। কাঠামো, দড়ি, আচ্ছাদন সবই এতে তৈরি।

অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে এই প্রোটিনটির গঠন বেশ শক্তপোক্ত, সহজে ছিঁড়ে ফেটে যায় না। তাছাড়া অনেক রোগের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে কোলাজেন অণুটি। যেমন রিউমাটয়েড আরথারাইটিস, অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পনডেলাইসিস, স্ক্লেরোডারমা, গাঁটে ব্যথা বা পেশীর ক্ষয়ের ক্ষেত্রে মূলত কোলাজেনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আণবিক গঠনের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য কোলাজেন অণুর এমন দৃঢ়তা তা খুঁজে বার করা তাই ওয়াটসন ক্রিকের ডিএনএ অণুর গঠন আবিষ্কারের সমতুল্য একটি প্রচেষ্টা। অনেকের মতেই কাজটির জন্য রামচন্দ্রনের নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল।

প্রোটিন হল অ্যামাইনো অ্যাসিড নামের এক ধরনের অণুর পলিমার। পলিমারে অণুর সংখ্যা আট-দশটি থেকে শুরু করে কয়েক শো, এমনকী কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের শরীরের মোট কুড়ি রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। আলোচনার স্বার্থে এদের গঠন জেনে নেওয়া জরুরি। তার জন্য নীচের চিত্র ২ খেয়াল করতে হবে।

রামচন্দ্রন যখন কেমব্রিজে, সেই সময়ে, ১৯৫১ সালে আমেরিকান পদার্থবীদ লিনাস পাউলিং প্রোটিনের গঠনের উপর তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা চালাচ্ছেন। পলিমার গঠনের সময় চেইনের প্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিডের —COOH গ্রুপটি পরের অ্যামাইনো অ্যাসিডের $—NH_2$ গ্রুপের সঙ্গে বন্ধন তৈরি করে; যাকে বলা হয় পেপটাইড বন্ধন। একইরকমভাবে তৃতীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডটি দ্বিতীয়ের সঙ্গে, চতুর্থটি তৃতীয়ের সঙ্গে পেপটাইড বন্ধন তৈরি করে। এভাবেই গঠিত হয় প্রোটিন অণুর Back bone বা শিড়দাঁড়া। এটিকে বলা হয় প্রোটিনের **Primary structure** বা প্রথম ধাপের গঠন। এক্ষেত্রে প্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিডটির $—NH_2$ গ্রুপ এবং শেষ অ্যামাইনো অ্যাসিডটির —COOH গ্রুপের কারোর সঙ্গে বন্ধন তৈরি করার নেই, তারা মুক্ত। সেহেতু শুরুর প্রান্তটির নাম **N terminal** বা N প্রান্ত এবং শেষের প্রান্তটির নাম **C terminal** বা C প্রান্ত। পাউলিং দেখান যে প্রথম ধাপের গঠনের পর অ্যামাইনো অ্যাসিড পলিমার দুটি মুখ্য **Secondary structure** বা দ্বিতীয় ধাপের গঠন তৈরি করতে পারে— পলিমারটি একটি কাল্পনিক অক্ষ বরাবর পেঁচিয়ে তৈরি করতে পারে হেলিক্স, নাম তার আলফা হেলিক্স (α helix)— ঠিক যেন

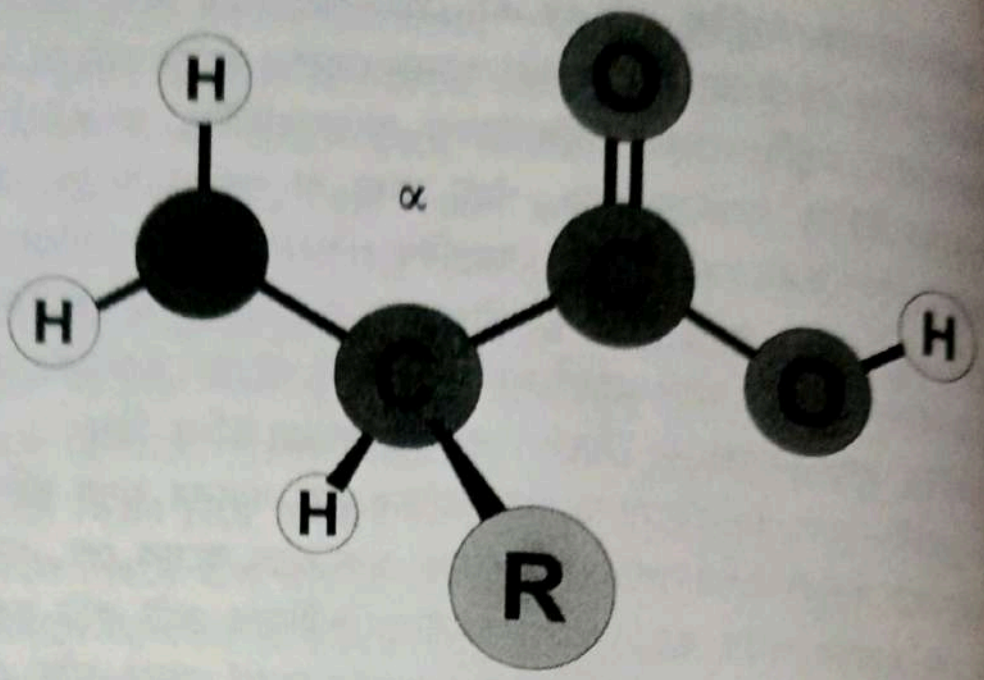

চিত্র ২: আয়োনিত নয় এমন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন। N—C—C বন্ধনীর মাঝখানের কার্বন পরমাণুটিকে বলা হয় আলফা কার্বন (Cα)। কার্বনের যোজ্যতা অর্থাৎ হাতের সংখ্যা চার। Cα-র বাঁদিকের হাতটি ধরে আছে অ্যামাইনো গ্রুপ ($—NH_2$), ডানদিকের হাতটি অ্যাসিড গ্রুপ (—COOH)। মাঝের দুটো হাতের পিছনেরটা ধরে আছে হাইড্রোজেন পরমাণু (—H)। আমাদের শরীরে যে কুড়ি রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় তাদের সবার ক্ষেত্রে এটি সাধারণ গঠন। তফাত হয় কেবলমাত্র R গ্রুপে— প্রতিটা ক্ষেত্রে এটা আলাদা। যেমন R গ্রুপ যদি একটি H পরমাণু হয় তবে অ্যামাইনো অ্যাসিডটি হবে গ্লাইসিন (Glycine); যদি $—CH_3$ গ্রুপ হয় তবে অ্যালানিন (Alanine) ইত্যাদি ইত্যাদি। চিত্র সৌজন্যে Techguy78/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

পদ্মের নালে জড়িয়ে থাকা গোখরো। আরেকটি হল বিটা প্লিটেড সিট (β pleated sheet)। এই ক্ষেত্রে পলিমারটি ক্রমশ ভাঁজ হতে হতে একটি ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। গঠনগুলি গড়ে তুলতে পলিমারটির নিজের ভিতরে উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণু এবং অন্যান্য পরমাণুর মধ্যে একধরনের বন্ধন, যা হাইড্রোজেন বন্ধন নামে পরিচিত, তা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। উপস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির R গ্রুপগুলির রাসায়নিক আচরণের উপর নির্ভর করে একটি পলিমারের কোনো অংশ α helix,

কোনো অংশ β sheet এবং অন্যান্য কিছু ধরনের গঠন পায়। সব মিলিয়ে যে গঠনটি তৈরি হয় তাকে বলে **Tertiary structure** বা তৃতীয় স্তরের গঠন। এরকম একাধিক পলিমারের সমন্বয়ে প্রোটিনের **Quaternary structure** বা চতুর্থ স্তরের গঠন তৈরি হয় এবং গঠন সমাপ্ত হয়ে প্রোটিন কর্মক্ষম হয়ে ওঠে।

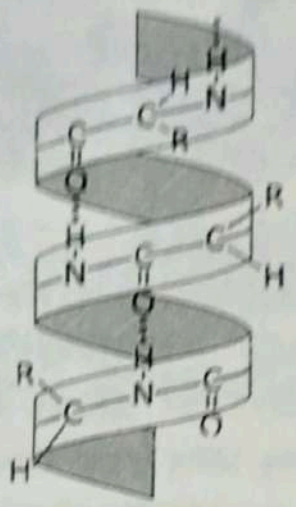

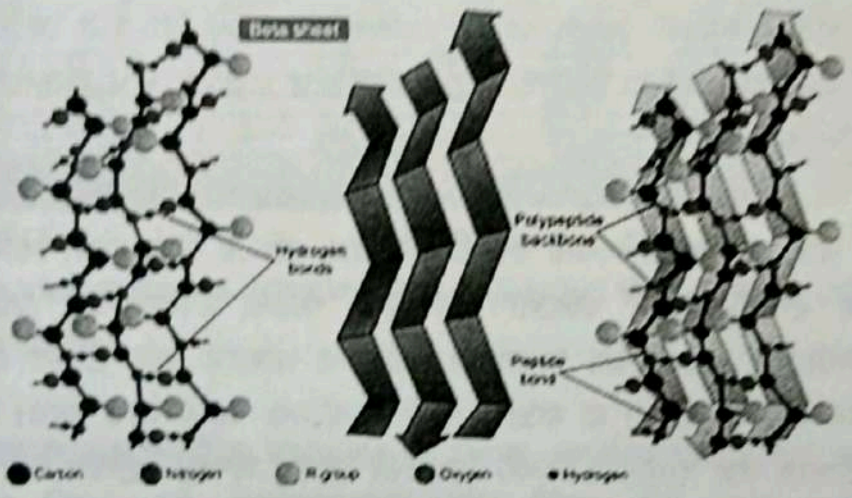

চিত্র ৩: আলফা হেলিক্স এবং বিটা সিট বা ভাঁজের উপস্থিতির কারণে বিটা প্লিটেড সিট। দুটিই তৈরি হয় হাইড্রোজেন বন্ধনের সাহায্যে (ওপরের ছবিতে ডট চিহ্নিত)। উল্লেখ্য, ডিএনএ ডবল হেলিক্সেও হাইড্রোজেন বন্ধন দুটি ডিএনএ চেইনকে একসঙ্গে ধরে রাখে।

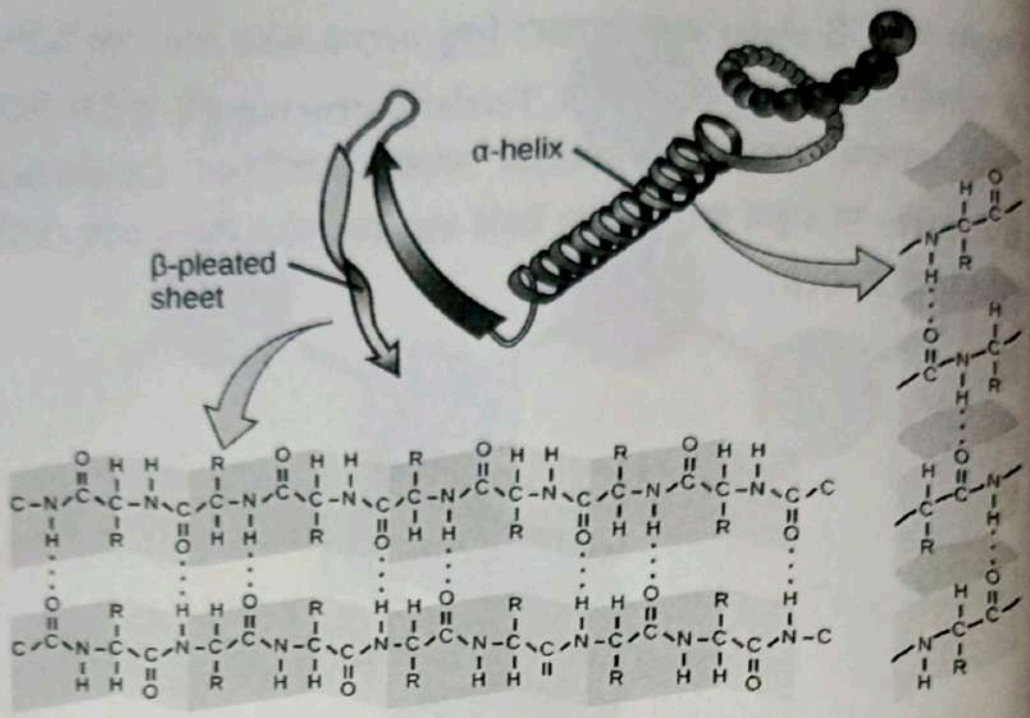

চিত্র ৪: প্রোটিনের তৃতীয় স্তরের গঠন তৈরি হয় আলফা হেলিক্স, বিটা প্লিটেড সিট এবং অন্যান্য আরও কিছু দ্বিতীয় স্তরের গঠনের সম্মিলনে। প্রোটিনের কিছু অংশ আলফা হেলক্স, কিছু অংশ বিটা সিট তৈরি করতে পারে। এমনও হতে পারে যে পুরো পলিমারটি কেবল আলফা হেলিক্স বা কেবল বিটা সিট তৈরি করল। প্রোটিনের ছবিতে বিটা সিটে তীর চিহ্ন পলিমারের N প্রান্ত থেকে C প্রান্তের দিক নির্দেশ করে।

রামচন্দ্রন পাউলিং-এর কাজটিই আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি এবং তাঁর পোস্টডক্টরাল ফেলো গোপীনাথ কারথা কোলাজেন প্রোটিনের ক্রিস্টালের এক্স-রশ্মির অপবর্তন পরীক্ষার মাধ্যমে তার ট্রিপল হেলিক্স গঠন প্রস্তাব করেন। যা মাদ্রাজ হেলিক্স নামেও খ্যাতি লাভ করে। তাঁদের পরীক্ষার ফল অনুযায়ী তিনটি বামাবর্তী আবর্ত সম্পন্ন হেলিক্স পরস্পরের সঙ্গে দক্ষিণাবর্তী আবর্তে বিনুনির মত পেঁচিয়ে কোলাজেনের একটি অণু গঠিত হয় (তৃতীয় স্তরের গঠন)। অণুগুলি আবার এক জায়গায় জড় হয়ে কোলাজেন তন্তু গঠন করে (Coiled-Coil structure: চতুর্থ স্তরের গঠন)। এই কারণেই কোলাজেন অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁরা আরও বললেন যে কোলাজেন অণুর পলিমারে তিনটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের ব্লক বারংবার

পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। তিনটির প্রথমটি গ্লাইসিন, দ্বিতীয়টি যে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড (তবে সাধারণত প্রোলিন বা হাইড্রক্সিপ্রোলিন), এবং তৃতীয়টি হাইড্রক্সিপ্রোলিন।

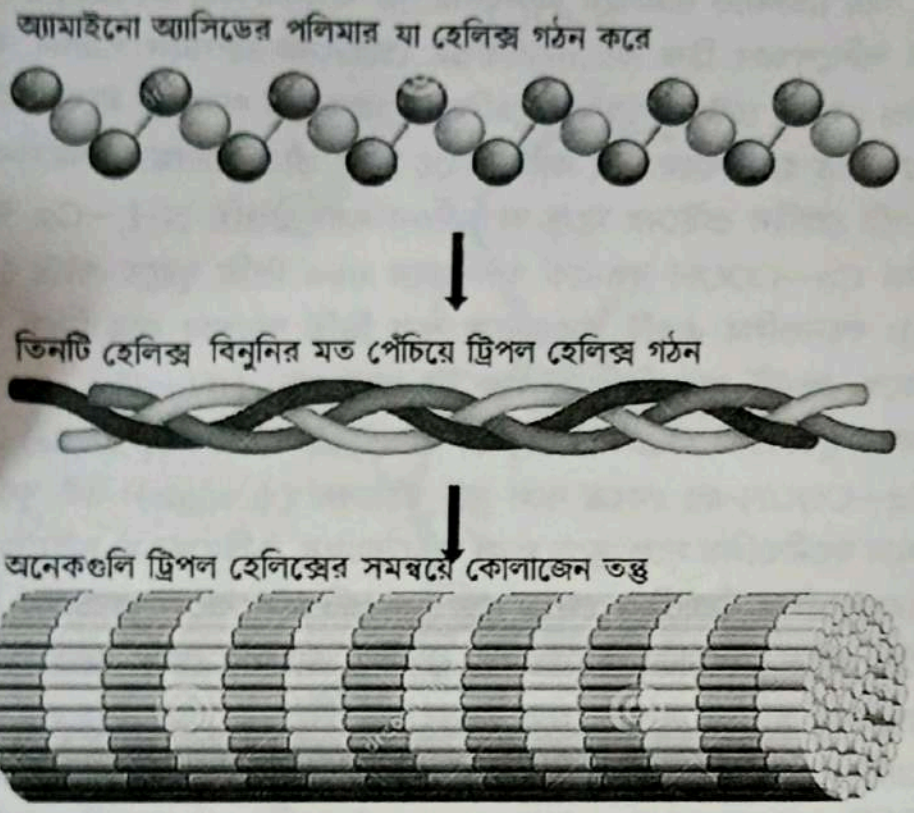

চিত্র ৫: রামচন্দ্রন প্রস্তাবিত কোলাজেন অণুর Coiled-Coil গঠন যা মাদ্রাজ হেলিক্স নামে সুপরিচিত।

রামচন্দ্রনের প্রস্তাবিত মডেলের বিরোধীতা এল ডিএনএ-হেলিক্স খ্যাত ফ্রান্সিস ক্রিক এবং কোলাজেনের গঠন নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্মরত আলেকজান্ডার রিচ-এর কাছ থেকে। তাঁরা ট্রিপল হেলিক্স মডেল মেনে নিয়েও বললেন তিনটি হেলিক্সের মধ্যে যে দূরত্বের কথা বলা হচ্ছে তাতে এমন ফাঁক নেই যেখানে অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিভিন্ন পরমাণুগুলি অবস্থান করতে পারে। প্রস্তাবিত মডেলে পরমাণুগুলি নিজেদের মধ্যে এমন

ধাক্কাধাক্কি করবে যে অণুটিই যাবে ভেঙে। সেই সঙ্গে তাঁরা বলেন যে সাম্প্রতিক সময়ে কোলাজেনের অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সিং তথ্য থেকে একথা বলা যায় যে রামচন্দ্রণ প্রস্তাবিত —গ্লাইসিন—প্রোলিন—হাইড্রক্সিপ্রোলিন— সজ্জা কোলাজেন অণুতে খুব একটা উপলব্ধ নয়।

এই প্রেক্ষিতে রামচন্দ্রন এবং তাঁর দুই গবেষণা-সঙ্গী সি রামকৃষ্ণন ও ভি শশিশেখরণ ঠিক করলেন বিভিন্ন প্রোটিনের ক্রিস্টাল পরীক্ষা করে তাঁরা বোঝার চেষ্টা করবেন যে হেলিক্সের মধ্যে দুটি পরমাণুর মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব কত হতে পারে। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে একটি প্রোটিন চেইনের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি NH_2—Cα বন্ধন এবং Cα—COOH বন্ধনকে অক্ষ করে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরতে পারে (চিত্র ৬)। বন্ধনগুলির একটি অবস্থানকে শূন্য ডিগ্রি অবস্থান ধরে নিয়ে তার থেকে বন্ধনটি কত ডিগ্রি ঘুরেছে তা মাপা হয়। NH_2—Cα বন্ধনের ক্ষেত্রে ঘূর্ণনের ফলে উৎপন্ন কোণকে বলে ফাই অ্যাঙ্গেল (ϕ angle) এবং Cα—COOH-এর ক্ষেত্রে বলে সাই অ্যাঙ্গেল (ψ angle)। এই ঘূর্ণনের ফলে বন্ধনীগুলির সঙ্গে জুড়ে থাকা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুগুলিও ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে অবস্থান পরিবর্তন করে। রামচন্দ্রন এবং তাঁর সঙ্গীরা পেপটাইড বন্ধনীগুলির ϕ ও ψ অ্যাঙ্গেল মেপে একটি প্লটের যথাক্রমে X অক্ষ এবং Y অক্ষ বরাবর প্লট করলেন। তাঁরা দেখলেন স্থায়ী প্রোটিনগুলির জন্য (বলা উচিত প্রতিটি স্থায়ী পেপটাইড বন্ধনের জন্য) নির্দিষ্ট ϕ ও ψ অ্যাঙ্গেল রয়েছে। ϕ ও ψ অ্যাঙ্গেলের মান তার বাইরে গেলেই প্রোটিন আর স্থায়ী হয় না কারণ তা প্রোটিনের মধ্যে দুটি পরমাণুর এমন অন্তর্বর্তী দূরত্বের সূচক যাতে একটি অপরটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে যাবে। ফলে প্রকৃতিতে সেরকম প্রোটিন অণু তৈরি হয় না। দেখা গেল স্থায়ী পেপটাইড বন্ধনীগুলির ϕ ও ψ অ্যাঙ্গেল প্লটের মাত্র কয়েকটি জায়গায় দ্বীপের মত হয়ে জমা হয়েছে (চিত্র ৭)। প্লটের বাকি জায়গায় ϕ ও ψ অ্যাঙ্গেলের মানগুলিতে স্থায়ী পেপটাইড বন্ধনী তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্লটটি থেকে কোনো প্রোটিন স্থায়ী হবে না ভেঙে যাবে তা অতি সহজে বোঝা সম্ভব, কেবলমাত্র ϕ ও ψ অ্যাঙ্গেল মেপে প্লটে ফেলার অপেক্ষা। এইভাবে প্রোটিন কেমিস্ট্রির একটি অত্যন্ত জটিল এবং আয়াসসাধ্য

বিষয়ের সহজ সমাধান পাওয়া গেল। এই প্লটই রামচন্দ্রন প্লট নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং এর সাহায্যে খুব সহজে ছাত্রছাত্রীদের প্রোটিনের গঠন বোঝানো যায়।

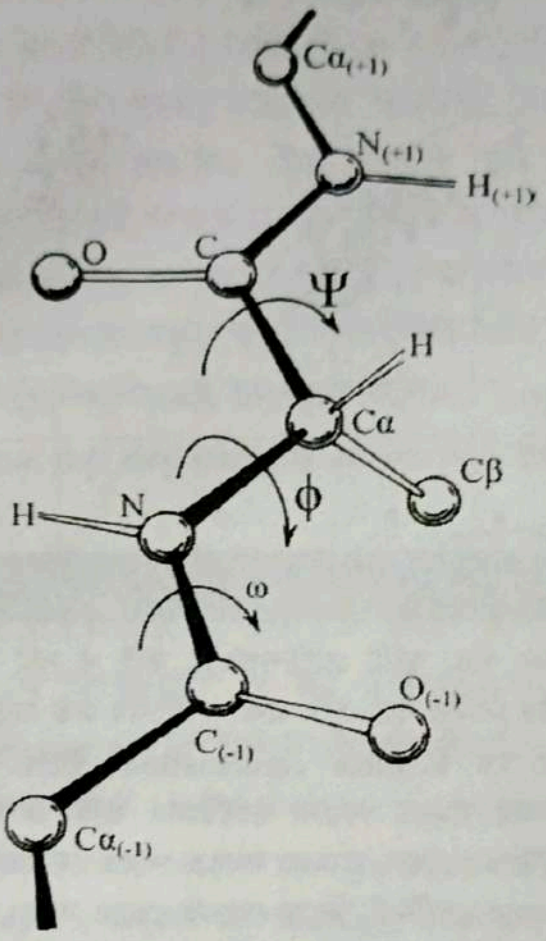

চিত্র ৬: একটি প্রোটিন অণুর শিড়দাঁড়ায় φ ও ψ অ্যাঙ্গেল। চিত্র সৌজন্যে Dcrjsr/ Wikimedia Commons, CC BY 3.0

৮ অক্টোবর, ১৯২২ কেরলের এরনাকুলামে রামচন্দ্রনের জন্ম। পিতা জি আর নারায়ণ আয়ার, মা লক্ষ্মী অম্মাল। পিতা ছিলেন কোচিনের মহারাজার নামাঙ্কিত কলেজের গণিতের প্রখ্যাত অধ্যাপক। মূলত তাঁর প্রভাবেই রামচন্দ্রন গণিতে তুখোড় হয়ে ওঠেন। বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে তাঁর ১০০ শতাংশ নাম্বার বাঁধা থাকত। ১৯৩৯ সালে ইন্টারমিডিয়েটে

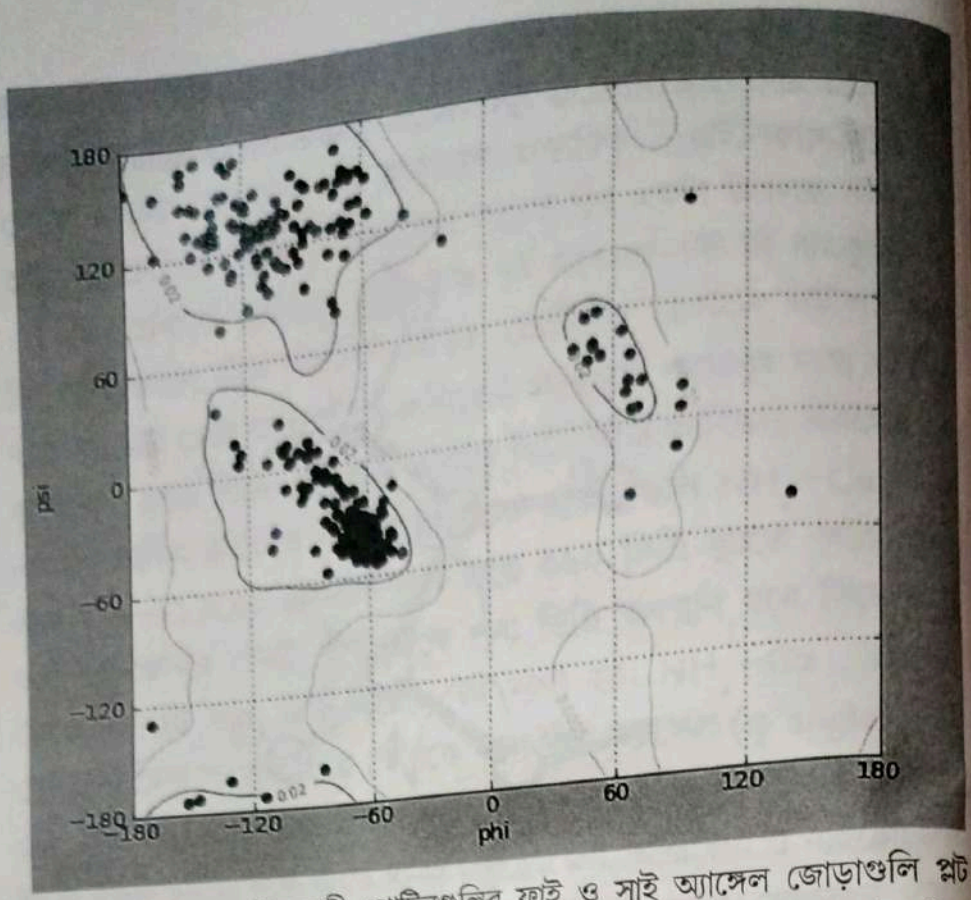

চিত্র ৭: রামচন্দ্রন প্লট। স্থায়ী প্রোটিনগুলির ফাই ও সাই অ্যাঙ্গেল জোড়াগুলি প্লট করলে তা প্লটের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে দ্বীপের মত জড় হয় (ছবিতে ডটগুলি)। এগুলিকে বলা হয় Possible combination। দ্বীপের চারিদিকে Impossible combination-এর সমুদ্র। কোনো প্রোটিনের ফাই ও সাই অ্যাঙ্গেল দ্বীপগুলির যেকোনো একটিতে পড়লে আমরা বলতে পারব যে প্রোটিনটি স্থায়ী হবে। বাকি অংশে পড়লে বলব প্রোটিনটি নিজে থেকেই ভেঙে যাবে। কলারসের পিএইচ অর্থাৎ আম্লিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন অণু গঠনকারী পরমাণুগুলির চার্জ (+/-) পরিবর্তীত হতে পারে। ফলে পরমাণুগুলির মধ্যে interaction পরিবর্তীত হয়। যেমন আগে যেটা ছিল attraction বা repulsion তা neutral হয়ে যেতে পারে বা আগে যা ছিল neutral তা হয়ে উঠতে পারে attraction বা repulsion। সেই সূত্রে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে পরমাণুগুলির অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে। ফলে ফাই ও সাই অ্যাঙ্গেলেরও পরিবর্তন ঘটবে। এক পিএইচ-এ স্থায়ী একটি প্রোটিন তাই পরিবর্তীত পিএইচ-এ অস্থায়ী হতে পারে।

সমগ্র মাদ্রাজ রাজ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ত্রিচির সেন্ট জোসেফ কলেজে ফিজিক্স অনার্সে ভর্তি হন। স্নাতক পরীক্ষায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাবা চাইতেন ছেলে

আইএএস হোক। কিন্তু ছেলের ইচ্ছে তেমন ছিল না। চাকরির পরীক্ষাগুলিতে স্বেচ্ছায় খারাপ ফল করে এসে তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এমএসসি ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু খুব দ্রুত তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর আকর্ষণের বিষয় পদার্থবিদ্যা। সে সময় ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন স্বয়ং সি ভি রামন। রামচন্দ্রন রামনের কাছে তাঁর ইচ্ছে প্রকাশ করলে পাকা জহুরি রামনের হিরে চিনতে দেরি হয়নি। তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভাগীয় প্রধানের কাছে রামচন্দ্রনকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু তা গ্রাহ্য হল না। বেশ কয়েকবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে তখন রামন রামচন্দ্রনকে নতুন করে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ভর্তি করে নিয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রধানকে বলেন, "I am admitting Ramachandran into my department as he is a bit too bright to be in yours..."।

রামনের তত্ত্বাবধানে আই আই এস সি-তে রামচন্দ্রনের গবেষক জীবনের শুরু। এ বিষয়ে রামচন্দ্রনের বক্তব্যের একটি অংশ থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারব যে 'যুগান্তকারী' যে সব গবেষণার কথা আমরা শুনি তার পিছনে basic science-এর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ—

> Raman knew that I understood principles of optics. He gave me a very important problem. This problem has been treated earlier by Raleigh- Jeans. Raman gave me Raleigh's paper and a book pertaining to this problem. In one day I was able to write the equation to the problem and work out the solutions. I was horrified to see the solution containing several hyperbolic sines and cosines. I had seen it before and I went to the library and found this volume with several formulas and equations. I was very pleased to find completely corresponding equations and solutions in that book. I wrote a very rigorous proof and

showed it to Raman. He was so pleased. He said we should publish the results, this was within one week of my joining Raman. That was a very useful result, which I used twenty years later in studying crystal perfection and the difference between mosaic and perfect crystals."

রামন আই আই এস সি কর্তৃপক্ষের কাছে মেধাবী ছাত্রটির জন্য যাট টাকার জলপানির সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁর মাস্টার ডিগ্রি ছিল না বলে কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করে। তখন রামন নিজেই তাঁর জন্য একশো তিরিশ টাকার একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। রামচন্দ্রনের কাঁধে একটি এক্স-রে ডিফ্র্যাক্সন ইউনিট স্থাপনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি নিজের চেষ্টায় ক্রিস্টালোগ্রাফি শেখেন এবং সে বিষয়ে ইন্সটিটিউটে বক্তৃতাও করতেন। এই সময় তিনি Herman Weyl-এর লেখা গ্রুপ থিওরির একটি বই পড়েন যা বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

১৯৪৪ সালে রামচন্দ্রন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করে (আই আই এস সি তখন ডিগ্রি-প্রদানকারী সংস্থা ছিল না) রামনের তত্ত্বাবধানে ডক্টরেট ডিগ্রির (ডিএসসি) জন্য গবেষণা শুরু করেন। হিরে, ফ্লুওরস্পার, জিঙ্ক ব্লেন্ড, ফিউজ কোয়ার্টজ ইত্যাদি কঠিন বস্তুর ফটো-ইলেকট্রিক এবং থার্মো-অপ্টিক আচরণ ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। এক-রে অপবর্তন প্রয়োগে ক্রিস্টাল গঠন বোঝার যে প্রাথমিক প্রচেষ্টা, তাঁর গবেষণা ছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনিই Topography শব্দটির প্রবর্তক। এই গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিতে লেখক হিসাবে কেবল রামচন্দ্রনের নামই থাকত। প্রফেসর রামন থাকতেন আড়ালে। আজকের দিনে যা ভাবাও মুশকিল।

১৯৪৭ সালে ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি কেম্ব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করতে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন এবং একটি অত্যন্ত সম্মানজনক ফেলোশিপে ভূষিত হন। ইচ্ছে ছিল ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর স্যার লরেন্স ব্রাগের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করবেন।

কিন্তু কোনো কারণে তা না হয়ে ওঠায় তাঁকে ড. ডাবিউ এ উস্টারের কাছে কাজ করতে দেওয়া হয়। এখানে তিনি তাঁর ক্রিস্টালোগ্রাফি সম্বন্ধীয় কাজগুলিই চালিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেন। কেম্ব্রিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে রামচন্দ্রন লিখছেন—

> In 1947 I went to Cambridge, England, to work in the Cavendish Laboratory with Dr. Wooster. Dr. Taylor was the head of the crystallography group. I did not attach myself to any College in Cambridge and I was in Fritzwilliam House. I did not like to wear those gowns like the ones the undergraduates were expected to do. I decided to work for a doctoral degree because then there would be something to show for my work; simply getting a few publications does not impress authorities in India. My decision may have definitely helped me in getting my first job in Madras..."

কেম্ব্রিজের বছরগুলো তাঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর স্বপ্নের নায়ক পাউলিং-এর সঙ্গে এখানেই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি পাউলিং-এর এমনই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি কবিতাও লেখেন—

Linus Pauling
Is a name to conjure with,
In chemical bonding
And whatever forthwith
Follows for all matter,
Both inanimate and alive
Their nature and character
And how they will behave.
His great alpha helix,

That opened the path
For the solution of structures
Of all biopolymers,
Is a star that will adorn
The firmament of Science,
For it has revealed to biologists
Completely new ways.

১৯৪৯-এর জানুয়ারিতে কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে তিনি আই আই এস সি-র পদার্থবিদ্যা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। যে এক্স-রে ডিফ্র্যাক্সন ল্যাবরেটরি তৈরি করতে তিনি ছাত্র অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন তাঁকে সেটির দায়িত্ব নিতে হয়। রামন সে সময় আই আই এস সি থেকে বিতাড়িত। রামচন্দ্রন সি রাধাকৃষ্ণন, গোপীনাথ কারথার মত প্রতিভাবান বেশ কয়েকজনকে এই গবেষণাগারে নিয়ে এসে একটি শক্তিশালী গবেষক দল গড়ে তোলেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ লক্ষণস্বামী মুদালিয়ার এই সময়ে তাঁর প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার একটি পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তিনি প্রফেসর রামনকে বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করার অনুরোধ করলে রামন তা গ্রহণ না করে রামচন্দ্রনের নাম সুপারিস করেন। মাত্র তিরিশ বছর বয়েসে ১৯৫২ সালে রামচন্দ্রন ওই পদে বসেন। এই পর্বে তাঁর গবেষণা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে খ্যাতির চরমে পৌঁছে দেয়। ১৯৬৩ ও ১৯৬৮তে তাঁর নেতৃত্বে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় যে সম্মেলন আয়োজন করে তাতে হাজির হয়েছিলেন সে সময়ে পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু মুদালিয়ারের অবসরের পর নতুন ভাইসচ্যান্সেলর সুন্দরভাদিভেলুর (Sundaravadivelu) রামচন্দ্রনের কাজের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বা সম্মান ছিল না। অনিবার্য সংঘাত রামচন্দ্রনকে বাধ্য করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করতে (১৯৭০)। তিনি আবার আই আই এস সি-তে ফিরে যান। তখন সেখানকার অধিকর্তা প্রফেসর সতীশ ধাওয়ান। তিনি রামচন্দ্রনকে

চিত্র ৮: ১৯৬৭ সালে মাদ্রাজে আয়োজিত International Symposium on Conformation of Biopolymers-এ উপস্থিত ব্যক্তিত্বরা। বাঁদিক থেকে ডরোথি হজকিন্স, লিনাস পাউলিং, স্যার এ এল মুদালিয়ার এবং রামচন্দ্রন। ছবি সৌজন্যে Nature Structural & Molecular Biology পত্রিকা।
https://www.nature.com/articles/nsb0601_489/figures/1

মলিকিউলার বায়োফিজিক্স বিভাগ স্থাপনের দায়িত্ব দেন। ১৯৭১ সালে রামচন্দ্রনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বিভাগটি কয়েক বছরের মধ্যে স্ট্রাকচারাল বায়োলজি গবেষণার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি লাভ করে।

কেবল বিজ্ঞান নয়, ভারতীয় দর্শনেও রামচন্দ্রনের প্রজ্ঞা ছিল অপরিসীম। ড. সুবোধ মহান্তি তাঁর দার্শনিক বোধ সম্বন্ধে লিখছেন—

> "If you think you know it, then you do not know it, and if you know that you cannot know it, then you know it". Ramachandran elaborated on this interesting paradox from the ancient Hindu philosophy used to describe the Divine force of the Universe in Kena Upanishads in one of his Mathematical Philosophy (MATPHIL) reports.

রামচন্দ্রনকে আজীবন লড়াই করতে হয়েছিল নিজের মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে। তিনি কল্পনা করতেন লোকে তাঁর মন পড়বার চেষ্টা করে এবং ভাবনা প্রক্রিয়া গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে এই অসুস্থতাকে পরাজিত করেই তিনি সম্ভব করে তুলেছিলেন বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর পথ চলা।

শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত সফল মানুষটি ছিলেন কিছুটা বদমেজাজী। কখন যে কার উপর রেগে দু-কথা শুনিয়ে দেবেন তা কেউ বুঝতে পারত না। আবার রাগ পড়লে ক্ষমা চাইতেও দেরি করতেন না। অনেক সময়েই ছাত্র বা সহকর্মীদের তাঁর কথা বুঝতে অসুবিধা হত কারণ তিনি যে উচ্চতায় উঠে কথা বলতেন তা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে থেকে যেত। তিনি আশা করতেন বাকিরাও তাঁরই মত প্রতিভাবান হবেন। ভারতের মাটিতে কাজ করা শেষ বিজ্ঞানী যাঁর দিকে সারা বিশ্ব তাকিয়ে থাকত সেই শেষ মোহিকান জি এন রামচন্দ্রনের দেহাবসান ঘটে ২০০১ সালের ৭ এপ্রিল। যতদিন মানবসভ্যতা টিকে থাকবে ততদিন তাঁর সৃষ্ট প্লটটি বইয়ের পাতায় রয়ে যাবে নবীন বিজ্ঞানীর পাঠ্য হিসাবে।

জি এন রামচন্দ্রন সম্বন্ধে আরও জানতে পড়ুন *Ramachandran: A Biography of Gopalasamudram Narayana Ramachandran, the Famous Indian Biophysicist. Raghupathy Sarma (1999). Adenine Press.*

তথ্যসূত্র

G. N. Ramachandran: A Jewel in the Crown of the Indian Science. https://vigyanprasar.gov.in/g-n-ramachandran/

Remembering the Work of G.N. Ramachandran and Others in the Time of COVID-19. Deepika Calidas. HTTPS://SCIENCE.THEWIRE.IN/CATEGORY/SOCIETY/HISTORY/

—সম্পাদক